# দলছুটের জবানবন্দী ২

নন্দিনী হোসেন

জানুয়ারী ১৯, ২০০৫

পূর্ববর্তী পর্বের পর থেকে ...

আমার ক্লাসের পড়াশুনা বলতে গেলে প্রায় লাটে উঠার যোগার হলো। যতটুকু সময় পড়াতে না দিলেই নয়, ঠিক ততখানি সময় কোন মতে পার করে দিয়ে, নিজের নতুন আবিষ্কৃত জগতে সটকে পরতাম সময়ে অসময়ে। আধাখেঁচড়া করে পড়া শুনার পাট চুকিয়ে, আর নানা টাল-বাহানা করে দিন পার করতে লাগলাম। ফল যা হবার তাই হলো। মোট কথা যা আগে স্বপ্নেও ভাবিনি সেটাই হলো প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। বাসায় টিচার যেসব পড়া দিয়ে যান বিশেষ করে অংক, তাতে হাত আর ছোঁয়ানোই হয় না প্রায়। এমনিতেই অংক আমার দু'চোক্ষের বিষ। একটা সোজা রাস্তা আবিষ্কার করলাম। স্যার এলেই যখন অঙ্কের খাতা বের করার সময় হতো,তখন অম্লান-বদনে বলে দিতাম, স্যার আমি তো কিছুই বুঝিনি তাই অঙ্কগুলো কষতে পারিনি। স্যার তখন চোখ কপালে তুলে বলতেন, সেদিন যখন নতুন নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিলাম, তুমি না সাথে সাথেই বুঝতে পারলে? তখন আমার লজ্জা লজ্জা মুখ করে তৈরী জবাব, তখন তো বুঝেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে আর মনে রাখতে পারি নি। ভাবখানা এমন বুঝেও যদি মনে না থাকে, তাহলে আমার আর কি করার থাকতে পারে ! স্যার প্রতিদিন ই নানা কসরত করে আমাকে অংক বোঝানোর পণ করে মাঠে নামেন। কিন্ত ফলাফল হয় জিরো। বছরের শেষে দেখা গেলো আমার রোল নং দুই থেকে ছয় এ নেমে গেছে । আমার তো মাথায় হাত। কি করে বাসায় গিয়ে বলবো। বললে কেমন ঝড় ঝাপ্টা যে বয়ে যাবে তা মনে করে শিউড়ে উঠলাম। প্রথমে মনে মনে ফন্দি আটলাম পরীক্ষার ফলাফল আপাতত যত দিন পারা যায় লুকিয়ে রাখবো, পরে যা হয় হবে। কিন্তু সে চিন্তা বাতিল করতে হলো । কারণ ফল প্রকাশের তারিখ যে আজ, সেটা সবার ভালো মতোই জানা আছে । কি আর করা। ভারাক্রান্ত মনে আল্লার নাম জপতে জপতে বাসার পথ ধরলাম।

সেদিন কি হলো না হলো এত সব প্যাঁচালে না গিয়ে শুধু একটা কথাই বলতে পারি, যতই ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাক না কেন, দু দিন পরই আবিষ্কার করলাম তা থেকে আমি কোন শিক্ষাই নেইনি! *যথা পুর্বং তথা পরং* করেই পার করছি দিন । আমার অভিবাবক আর শিক্ষক মিলে যত আমার উপর খরগ হস্ত হোন,তত ই আমি নতুন নতুন বর্ম আবিষ্কার করি । সেই আদি ও অকৃত্রিম বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরোর নানা ফাঁক ফোক র খোঁজে আমি আমার মতোই চালাতে লাগলাম।

নতুন ক্লাসে উঠেই নতুন বই কেনার যে কি আনন্দ,কি শিহরণ তা নিশ্চয় আমাদের দেশের সব পড়ুয়ারা কম বেশী স্বীকার করবেন । আমার ও ছিল নতুন বই পাওয়ার প্রবল আগ্রহ উদ্দীপনা।

বলতে কি বছর শেষে নতুন ক্লাসে উঠার অন্যতম প্রধান আকর্ষণই ছিল আমার কাছে নতুন ঝকঝকে এক সেট বই পাওয়ার আনন্দ । বই আসার সাথে সাথেই আমার কাজ হলো সবগুলো বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকবার উলটে পালটে দেখা । দেখা পর্ব শেষ হলে,অংক বাদে অন্য বই গুলো মোটামোটি পড়ে শেষ করে ফেলা। পরিণতিতে স্কুলের ক্লাস আর গৃহশিক্ষকের কাছে ছাড়া বই গুলো খোলা হতো খুবই কম । ফলাফলের

বহরটাও নিশ্চয় এতক্ষনে আঁচ করা যাচ্ছে । নিজে আর নাই বা বললাম ! আমার তো মনে তখন অন্য ধান্দা। বাংলায় লিখা ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যা কিছু বই আছে সব পড়তে হবে তো ! এটা তো আর সহজ কর্ম নয়। কি কি বই আছে তাই বা জানবো কি করে। আমার তো আবার একলা চলো নীতিতে চলছে সব। সাহস, ইচ্ছা, উপায় কোনটাই নেই কাউকে কিছু বলার। সবেধন নীলমনি বোন টাকে ছাড়া কাকেই বা মনের কথা বলি। তার সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো আপাতত যখন যেখানে আমরা যাবো, খোঁজ করে দেখবো ওসব জায়গায় যদি বই টই কিছু পাওয়া যায়। তাছাড়া আরেকটা গুরুতর অন্যায় করার ও তখন হাতেকড়ি হলো! আমার মা এমনিতে যতই কড়া ধাতের হোন না কেন। কিছু কিছু ব্যাপারে ছিলেন বেশ ঢিলেঢালা স্বভাবের। বিশেষ করে যেখানে সেখানে টাকা পয়সা সহ মুল্যবান জিনিষ পত্র ফেলে রাখতেন। অনেক সময়ই তালাচাবি দেওয়া থাকতো না। তাছাড়া সাধারণ ড্রয়ারে দিনের পর দিন পরে থাকতো। অনেকবার জিনিষ পত্র খোঁয়া গেছে ,তারপর ও কোন সাবধানতা ছিল না। আগে যদি ও এসব ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি মা'র অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে এখান সেখান থেকে টাকা পয়সা সরাচ্ছি। সোজা বাংলায় চুরি যাকে বলে! তাতে মনের আনন্দে অত্যন্ত গোপনে কিছু কিছু বই কেনা চলতে লাগলো। যা একেবারেই আমার নিজস্ব সম্পদ! আমার উত্তেজনা তাতে আর ও বহুগুন বেড়ে গেলো।

**পাপ বা গোনাহ :** শুধু তো আর নিজের পড়া ফাঁকি দেওয়া বা মা'র টাকা পয়সা সরানো নয়,আর ও যে সব বহুবিধ উপসর্গ দেখা দিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইসলাম ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা। এ ব্যাপারে মোকসুদুল মুমেনীন ছিল আমার প্রধান পথ প্রদর্শক! এই বইটি আমার প্রায় নিত্য সংগী হলো। তবে ধরা পরার ভয় যে ছিল না তা নয়। তার কারণ ছিল এই বইতে বর্ণীত নানা নোংড়া ব্যাপার স্যাপার। যদি মা জানতে পারেন আমি এসব পড়ছি, তাহলে সন্দেহ নেই বেশ ঝামেলায়ই পরতে হবে। তাছাড়া নিজের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা সহ সাম্প্রতিক আরও নানা রহস্য উদঘাটিত হওয়া ও বিচিত্র কিছু নয়। তাই অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হতো। তবে আমি এই বইয়ের অনেক শব্দের মানেই কিন্ত বুঝতে পারতাম না। বুঝা অবশ্য তখন সম্ভবও ছিল না! তবু আমার ধারণা হয়েছিল খাঁটি মুসলমান হতে হলে এই বইটি পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা হচ্ছে প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য! কিন্তু মুশকিল হলো অনত্র। বই গুলোর মালিকানা যদিও আমার মার, মাঝে মাঝে তাকে এই সব বই পড়তেও দেখি; কিন্তু তিনি এসব কিছুই প্রায় পালন করেন না। তাহলে বই রাখা কেন, আর পড়াই বা কেন, তার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতাম না। আমি এসব বইয়ে অনেকবার পড়েছি যে, সব জেনে শুনেও যদি কেউ ঠিকমতো ধর্মের প্রতিটি নিয়ম কঠোর ভাবে পালন না করে,তাহলে তার জন্য শাস্তির বহরও হবে সেই পরিমানে বেশী। আমার ভীষণ মন খারাপ হতো মা'র কথা মনে করে। খুব ইচ্ছা হতো, বুঝিয়ে, সুঝিয়ে মাকে সঠিক ভাবে ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করতে অনুরোধ করি! যদিও শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাতো না !

এমনি তেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত । খালি পাপ আর পাপ। কি করলে যে পাপ হবে না সেটা খোঁজে পাওয়াই মুস্কিল ! নিজের চিন্তায়ই বাঁচি না,তায় মরার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো নিজের মা সহ অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের (অবশ্যই নারী) পাপ কাজের গোপন লিষ্ট ও করতে লাগলাম আমার নিজস্ব নোটবুকে ! তার একটা classic নমুনা বলি ! তাহলে খানিকটা হয়তো আন্দাজ করা যাবে আমার obsession ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল ! কোন বইয়ে জানি পড়েছিলাম,আজ আর নাম মনে নেই,(খুব সম্ভব মোকসুদুল মোমেনীন হবে হয়তো) যে সতী নারী নাকি তিনি যিনি স্বামীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই নারীর বেহেস্ত গমন মোটামোটি অবধারিত । আর যায় কোথায়! আমি লেগে গেলাম নিজের আত্বীয় স্বজনের মধ্যে কোন কোন নারী আছেন বর্তমানে বিধবা তার খোঁজ করায়! বেশী দূর যেতে হলো না অবশ্য। স্বয়ং আমার নিজের নানুকেই (নানী) পেয়ে গেলাম হাতের কাছে! আমার নানা মারা গেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পর পরই, আমার খুবই অল্প মনে পরে তাকে। বেশী কিছু মনে নেই দু'চারটা কথা ছাড়া। কিন্তু আমার নানু (নানী) আমি

যখন ক্লাস ফাইভ /সিক্সে পড়ছি তখন ও বহাল তবিয়তে বেশ ভালো রকমই জীবিত আছেন। এই ব্যাপারটা আমাকে রীতিমত পীড়া দিতে লাগলো ! আমি ধরেই নিলাম আমার নানু পাপী! তিনি কখন ও বেহেস্তে যেতে পারবেন না !মনে মনে নিজে বিচারক সেজে নানুকে রীতিমত আসামীর কাঁঠগড়ায় দাড় করালাম !

পেটের ভিতর কথা গুলো এমনি গুরগুর করতে লাগলো যে কাউকে কিছু না বলে পারছিলাম না । আমার বোন কে ধরলাম প্রথমে এই অতীব গোপনীয় কথাটি বলার জন্য। কানে কানে তাকে বললাম ,জানিস নানু না কখন ও বেহেস্তে যাবেন না! তার কারণ হলো, নানা তো অনেক আগে মারা গেছেন। অথচ নানু দেখ, এখন ও বেঁচে আছেন ! এমন ভাব নিয়ে বললাম যে নানুর এরকম করে আজও ঢেং ঢেং করে বেঁচে থাকাটা একটা মারাত্মক রকম অন্যায় হচ্ছে! তাকে আর ও খোলাসা করে বোঝালাম যে, সতী সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর হাতে মারা যান। নানু তো তা নয় ! আমার বোন বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে অদ্ভুত চোঁখে তাকিয়ে থেকে, সে এমনভাবে একটা কথা ও উচ্চারণ না করে উঠে চলে গেলো যে; আমি মারাত্বক রকম অপমানিত বোধ করলাম । আমি আর খামোখা সময় ব্যয় করে তাকে বোঝানোটা যুক্তিসংগত মনে করি নি। তার কিছুদিন পরই আমার থেকে বয়সে বড় কিন্তু আমার সাথে ভীষণ সখ্য খালাতো ভাই এলো বেড়াতে আমাদের বাসায়। অনেকক্ষণ উঁসখুস করে সদ্য শেখা কথাটা তার কাছে পারলাম। অবিকল যে রকম করে বোন কে বলেছিলাম সে রকম করে ! তাকে বললাম,জানো ভাইয়া, আমাদের নানু না কোন দিন বেহেস্তে যাবেন না! সম্পূর্ণ কথাটা বলে যখন মাত্র শেষ করেছি ,তখন সে দেখি অবিশ্বাসের ভংগীতে মাথা নাড়ছে। তাছাড়া এমন ভাবে আমার আপাদমস্তক জরিপ করছে, যেন আমার মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে !সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল,আচ্ছা , তুই নানা নানুর বয়সের পার্থক্যটা জানিস ? আমি মাথা নাড়লাম জানি না বলে। এসব কোন দিন ই মাথায় আসে নি। বললাম তুমি জানো? ঠিক জানি না, তবে অ-নে-ক হবে । আর সেই জন্যই শুধু আগে না,অনেক আগে অক্কা পাওয়াটা নানার জন্য অতি স্বাভাবিক ! তার কথার ধরণ শুনে আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম। আমি চুপ করে আছি দেখে বললো ,ভেবে দেখ নানা যখন রিটায়ার্ড (ব্রিটিশ শাসিত সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট) করেন তখন ও কিন্তু আমাদের মা খালা মামারা বেশীর ভাগ বলতে গেলে কচিকাঁচা ছিলেন। এই জন্য তো দেখিস নি, তিনি বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত লাস্টিং করতে পারলেন না! এ দিকে নানু এখনও চূলে কলপ টলপ ছাড়াই এক মাথা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কালো চুল নিয়ে দিব্যি আছেন! কথা গুলো বলেই ফিক রে এমন একটা হাসি দিলো যে আমার তা দেখে পিত্তি জ্বলে গেলো। এত বড় অকাট্য যুক্তি শুনে ও আমি আমার মতামত থেকে এক বিন্দু টলতে রাজী হলাম না । তার অবশ্য কারণ আছে,আমি যেহেতু ধরেই নিয়েছি বইয়ে বর্ণীত এই সব কথা অভ্রান্ত । কোন ধরনের ভূল ভ্রান্তি তাতে থাকাটা অসম্ভব। সেই বিশ্বাসের জোরে বলীয়ান হয়ে আমি তাকে বললাম দেখো, এসব বয়স টয়স কোন ব্যাপারই না । তিনি সতি সাধ্বী নারী হলে ঠিকই নানার আগে মারা যেতেন!

শুধু তাতেই শেষ ছিল না। পাপ থেকে দূরে থাকা এবং বেহেস্তে যাওয়াটা আর ও সহজ করে বললে বলতে হয় দোযকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যে কি ভাবে সম্ভব হবে, তাই নিয়ে চিন্তা করে করে আমার অবস্থা হলো খুবই শোচনীয় । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজে কি কি গুনাহ করলাম সে সবের হিসাব তো আছেই,আমার মা'র জন্য ও আমি ভয়ানক রকম চিন্তিত হলাম! ইসলামী বেহেস্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পাওয়ার যে standard ধরা হয়েছে নারীদের জন্য, তাতে তিনি কোন ভাবেই পরেন না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো । অন্যদের কথা যেমন তেমন কিন্তু মা বলে কথা। আমি নিদারুণ কাতর হয়ে থাকতাম আমার মা'র নির্ঘাত দোযক বাসের কথা কল্পনা করে! অকস্মাৎ তার পাপের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আমার চোঁখে ধরা পরতে লাগলো। নামায আদায়ে বেশ ভালো মতই গাফলাতি আছে। মাথায় হিজাব (অবশ্য তখন এসব ইসলামী কায়দা কানুন এমন ব্যাপক ভাবে চালু হয় নি) তো দূরের কথা, স্লীভলেস ব্লাউজ পর্যন্ত পরেন । ভ্যানেটি ব্যাগ দুলিয়ে ঢং করে বোনের সাথে মিলে সিনেমা দেখতে যান । আর ও কত কি ! এ গুলো

তো গেল যেমন তেমন, সব চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো,স্বামীর সাথে তার ব্যবহার আমার কাছে যথাযথ মনে হতো না ! আমি খুব মনোযোগের সাথে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতাম! আর বলা ই বাহুল্য, ভীষণ ভাবে পীড়িত বোধ করতাম।

এই সব ধর্মীয় বই পুস্তক পড়ে আমার মাথায় তখন ভয়াবহ ভাবে গেড়ে বসেছে *স্বামী* নামের এক আজব প্রাণী! তাকে *স্ত্রী* নামক চলে ফিরে বেড়ানো পুতুলদের কি করে সদা সর্বদা ,সর্ব অবস্থায় খুশী রাখতে হয়! কিন্তু আমার মা তেমন কোন সেবা যত্ন করেন বলে মনে হয় না। অবশ্য দুজনের তাতে কিন্তু ভাবের কমতি নেই মোটেই! তবু আমার কেবলই মনে হতে থাকে আমার বাবা মনে মনে হয়তো কত ই না অসন্তষ্ট স্ত্রীর প্রতি! মা'কে যে কিছু পরামর্শ দেবো, সে সাহস ও নেই !তবে আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা জারী থাকলো আমার মার মতি গতি যেন ফেরে। যেন তিনি স্বামীর যত প্রকার সেবা যত্ন আছে সব করেন হাসি হাসি মুখে! একমাত্র ভরসা যদি তার স্বামী তাকে মাফ করে দেন! মাঝে মাঝে এটা ও প্ল্যান করি, নিজেই কি করে মা'র হয়ে বাবার কাছ থেকে মা'র জন্য মাফ চেয়ে নেবো । শত হলেও মেয়ের অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি কি তিনি আর রাখবেন না! কিন্তু কি ভাবে যে করি, সাহসের যে বড্ডই অভাব ! এবার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা
কিছু না বললেই নয়।

এই টুকুনি একটা মেয়ে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছি, স্বামী কে কখন ও কোন অবস্থাতেই অসন্তষ্ট করবো না! নিজের জীবন কে তুচ্ছ করে সদা সর্বদা তাকে হাসি মুখে সেবা যত্ন করবো। তার প্রধান কারণ অবশ্য ই দোযকের আজাব থেকে মুক্তিলাভের চিন্তা! বেহেস্তে যাওয়ার লোভ থেকে ও সহস্রগুণ আতংক আর ত্রাস আমার মনে সৃষ্টি হয়েছিল দোযকের ভয়ানক, নির্মম, বিভৎস সব শাস্তির বর্ণনা। এসব বর্ণনাতীত বিকৃত সব শাস্তির বিবরণ আমাকে মানসিকভাবে যে কি রকম কাবু করে ফেলেছিল তা যখন মনে হয়; এখনও নিজের মধ্যে এক ধরনের অসহায় ক্রোধ টের পাই। শুধু ভাবি কোন পর্যায়ের মানসিক বিকৃতি ঘটলে এই ধরনের বিচিত্র সব আজাবের বর্ণ না ধর্মের নামে চালু হতে পারে! যাই হোক। আজও যখন দেখি এই সব (মোকসুদুলমোমেনীন জাতীয়) বই বাজারে চালু আছে এবং রমরম করে চলছে, তখন আমার সেই শৈশবের চিত্র টা ভেসে উঠে চোঁখের সামনে। এখন বোধ করি সময় এসেছে ধর্মের নামে ক্ষতিকর এসব বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা । ধর্মের নামে তা যে কোন ধর্ম ই হোক না কেন জোর জবরদস্তি করে, দোযকের আজাবের ভয়, আর বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে ভেড়ার পালের মতো মানুষ কে যুগ যুগ ধরে এক অদ্ভুত যুক্তিহীন অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে এগুতে দিচ্ছে না সামনের দিকে। সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মের হাতে মাত্র দুটিই অস্ত্র আছে। তার একটি হচ্ছে লোভ আর অন্যটি ভয়! বেহেস্তের লোভ, আর দোযকের ভয় দেখানো! এই তো! এর কোনটাই মানব সভ্যতার জন্য, মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। আধিকাংশ মানুষ তাই পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার বদলে শুধু লোভ আর ভয়ের চর্চা করে আসছে। তার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত এই দুটো উপাদান দ্বারা। যা হোক, এ ব্যাপারে আর বেশী কিছু বলার ইচ্ছা নেই আমার আপাতত।

**স্বামী :** এই শব্দ যে মানুষটি ধারণ করবে ভবিষ্যতে আমার জন্য, তাকে কি করে সুখি করবো,সারাক্ষন হাসি হাসি মুখে তার সেবা যত্ন করবো; যেন সে কখন ও কোন কারণে আমার প্রতি অসন্তষ্ট হতে না পারে । এসব ই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান! আমার ত্যাগ তার জন্য কতখানি হবে, তারও একটা মহা পরিকল্পনা করে ফেললাম মনে মনে! তার দু'একটি উদাহরণ দিলে বোঝাতে সহজ হবে। আজ হুবুহু সব কথা মনে নেই,হাতের কাছে এখন মোকসুদুলমোমেনীনও নেই, জানি না এখন ও অবিকল সে সব কাহিনীর বর্ণ না আছে কি নেই; তবু স্মৃতি থেকে যা পারি উদ্ধার করে লিখছি, গল্পটি ছিল এরকম; তখন আরবের কোন এক মহিলা তার পিতা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ও তাকে দেখতে যায় নি বা যেতে পারে নি। তার কারণ হলো, তখন তার স্বামী অনেক দুরে ছিল তার থেকে, ব্যবসা বানিজ্য (খুব সম্ভবত) উপলক্ষে। তাই স্বামীর অনুমতি

নেওয়া সহজ ছিল না  বিধায় সে পিতা কে শেষ দেখা ও দেখতে যেতে পারে নি। সেই মহিলার এ ধরনের সবুরের দৃষ্টান্ত আমি ও পালন করবো সিদ্ধান্ত নিলাম ! আমার ও যদি মা বাবা মারা যান, আর আমার স্বামী তখন বিদেশ বা অন্য কোথা ও থাকেন, আমি তার অনুমতি না নিয়ে দেখতে যাবো না! তাতে  স্বামী-প্রবর না জানি কত খুশী হবেন আমার উপর,আর  আমার দোষকে যাওয়াটাও ঠেকানো যাবে !যাই হোক। আর ও এত কথা আছে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা যে বলবো,খেঁই হারিয়ে ফেলছি। তাই এখানেই ক্ষান্ত দিলাম আপাতত।

তবে একটি কথা উল্লেখ করতেই হয়, পরবর্তী জীবনে স্বামী শব্দটির প্রতি এমন বিরাগ সৃষ্টি হলো যে এক পর্যায়ে আমি যখন জানতে পারলাম বাংলা স্বামী শব্দটির মানে হচ্ছে *প্রভু* , তখন এই শব্দটি আমার কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য হলো।  আমার মানসিক এই পরিবর্তনটা ও এলো খুব ই দ্রুত ! এত দ্রুত আমার নিজের এমন আমুল পরিবর্তন ঘটে যাবে, আমি তখন কল্পণাই করতে পারি নি। আমার মনে তখন বাসা বাধতে শুরু করলো নানা ব্যাপারে সন্দেহ। সে আরেক উলটো স্রোত। আশা করি আমার পরের লিখায় সে সবের উল্লেখ থাকবে।

চলবে.....

---

*নন্দিনী হোসেন মুক্তমনার নিয়মিত লেখিকাদের একজন। তার 'দলছুটের জবানবন্দী' সিরিজটি কেবলমাত্র মুক্ত-মনার নতুন ওয়েব-সাইটের জন্যই বিশেষভাবে লিখিত।  অনুমতি ব্যতীত এ লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ কপিরাইটের লংঘন বলে বিবেচিত হবে।*